পয়লা বৈশাখ

আবদুর রউফ চৌধুরী

জীর্ণ-পুরাতন যাক ভেসে যাক ।
আমরা শুনেছি ওই মাভৈঃ মাভৈঃ মাভৈঃ
কোন নূতনেরই ডাক ।
– রবীন্দ্রনাথ ।

ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কালবোশেখির ঝড় ।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর
তোরা সব জয়ধ্বনি কর ।
– নজরুল ।

ওই যে পূর্ব তোরণ-আগে
দীপ্ত নীলে, শুভ্র রাগে
প্রভাত রবি উঠল জেগে
দিব্য পরশ পেয়ে ।
– জীবনানন্দ দাশ ।

বাঙালির জনজীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, যুগ যুগ ধরে উদযাপিত, দ্বন্দ্ববিদ্বেষহীন, অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ সাংস্কৃতিক উৎসবই হচ্ছে চির নূতনের কেতন উড়িয়ে আসা পয়লা বৈশাখ । জীবনের পুরনো ব্যর্থতাকে বিদায় জানিয়ে নূতনের প্রত্যাশায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমষ্টিগতভাবে, এক আত্মায় বাঙালি জেগে ওঠে তার আত্মোপলব্ধির এক অনন্য ও সার্বজনীন মহোৎসবে । পয়লা বৈশাখই বাঙালির আদি উৎসব, একান্তই বাঙালির নিজস্ব সম্পদ, একান্তই বাঙালি-সংস্কৃতির শিকড় ।

পয়লা বৈশাখ আসে সূর্যোদয়ের সঙ্গে। আসে রৌদ্রোজ্জ্বলরূপে– তাপ ও দহনের তীব্রতা, খররৌদ্রের তীক্ষ্ণতা ও বিপুল আবর্তের ঘূর্ণন নিয়ে; কখনও-বা বজ্রবিদ্যুতের ভয়াল ভ্রূকুটিরূপে। মাঝেমধ্যে সঙ্গী হয়ে আসে কালবৈশাখী ঝড় ও ঝঞ্ঝার তাণ্ডবনৃত্য– তখন রুদ্রভয়াল ঝড়ের ছোবলে তছনছ হয়ে যায় লোকালয়, ঘরবাড়ি, গেরস্থালি; তবুও কী বাঙালি তার প্রাণের অর্ঘ্য দিয়ে অকপটে বরণ করে নেয় না রুদ্রবৈশাখকে, করে, কারণ বাঙালি বৈশাখের ছোঁয়ায় শিক্ষাগ্রহণ করে প্রতিকূলতার বিপরীতে জীবনবাস্তববাদী হয়ে ওঠার পন্থা– ঝড়ের সঙ্গে, বানের সঙ্গে লড়াই করে জীবন গড়ার বাস্তবপন্থাটি, যার সঙ্গে মিলেমিশে থাকে বাঙালির সুর ও সঙ্গীত, মেলা ও মিলন, আনন্দ ও উল্লাস, সাহস ও সংকল্পের আহ্বান; তাই নতুন প্রতিজ্ঞা ও প্রত্যাশায় বাঙালি বুক বাঁধে জীবনের সমস্ত গ্লানি মুছে নিয়ে; এবং তারা সকল দীনতা ধুয়ে নূতন-জীবন গড়ার বন্দোবস্তে মেথে ওঠে। পয়লা বৈশাখ তার নিজস্বতায় ভেঙে দিয়ে যায় সকল ভেদ-বিভেদের প্রাচীর, সাম্প্রদায়িকতার বৈষম্যের বেড়াজাল।

পয়লা বৈশাখে নূতনের আগমনী সুর বেজে ওঠে বাঙালির রন্ধ্রেরন্ধ্রে, কারণ পয়লা বৈশাখ হচ্ছে আবহমান বাংলার নবপ্রাণে নূতন স্পন্দন বয়ে আনা প্রিয় অতিথি; ফলে বাঙালির জীবনের সঙ্গে পহেলা বৈশাখ এমন অঙ্গীভূত হয়ে যায়, যা বাঙালির শিরা-উপশিরার ধমনিপ্রবাহে বিলীন হয়ে যায়। বাঙালির জাতীয় জীবনের এই মহোৎসবে নগর-বন্দর-গ্রাম-গঞ্জ– সকল স্থানের মানুষ আনন্দাপ্লুত হয়ে ওঠে। বাঙালির জীবনের এমন মহাসম্মিলন আর কোথাও, কখনও, কোনওভাবেই বিস্তার লাভ করতে পারে না। বাংলায় অন্যকোনও দিন পয়লা বৈশাখের মত নিশ্চিত ঔদাসীন্যে সময়ের কলকণ্ঠকে উন্মোচিত করে না।

বাংলার লোকজীবনে নিস্তরঙ্গ গ্রাম-গঞ্জ-শহর-বন্দরে সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই হৃদয়াবেগে জেগে ওঠে পয়লা বৈশাখের ধুম। বাংলা জুড়ে পল্লীর মাঠে-ঘাটে, বটের তলে-ছায়ায়, নদী-খাল-বিলের ধারে-বাঁকে বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, নর-নারী পয়লা বৈশাখের নানা কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে পরিতৃপ্তি লাভ করে, এ-যে বাঙালির হাজার বছরের সংস্কৃতি। বাঁশের বাঁশি, তালপাতার পাখা, মঠির হাড়ি-সরা, মাটির তৈরি রঙ দেওয়া নানারকম হাতি-ঘোড়া, বেদিনীর চুড়ির পসড়া, আলতা, হরেকরকম মিষ্টান্ন সামগ্রী নিয়ে জমে ওঠা পয়লা বৈশাখ গ্রামীণ বিনোদনের এক মূর্ত প্রতীক। কুসুমকোমল প্রভাতে মুড়ি-মুড়কি, খই-বাতাসা দিয়ে আপ্যায়নে বাঙালি মেতে ওঠে জারি, মারফতি, ভাটিয়ালি, কবি গানের মাধ্যমে পয়লা বৈশাখ উদযাপনে, যা বাঙালি মননে এক অনন্য অনুষঙ্গ হিশেবে বিরাজ করছে যুগ যুগ ধরে। শোভাযাত্রা, আমানী, নৃত্যগীত, বীট, পরী নাচ, সঙখেলা, চড়ক ও স্বাদগ্রহণের মত কৃত্যানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আদি ও অকৃত্রিমভাবে বাংলায় বরণ করা হয় নববর্ষকে, কারণ কবি বলেন, 'এসো, দেখ তবে উৎসবের লীলা/ প্রকৃতির রঙ্গে রেঙ্গেছে বাঙালিরা'– এ-যে বাঙালি জাতির জীবন, সত্তা, সংস্কৃতি ও মাটি।

আনন্দ শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে পয়লা বৈশাখকে আবাহন করা হয়। দিনভর চলে এ আনন্দ। কোথাও আবার বৈশাখী মেলা বসে একদিন, তিনদিন বা সাতদিন ব্যাপী। বলা বাহুল্য, বাংলার লোকসাহিত্যের ভাঁজে ভাঁজে ছড়িয়ে আছে হাজার বছর ধরে চলে-আসা বাংলার লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন পর্যায়ক্রমিক ধাপগুলি। এ-থেকে বাঙালি তার সমৃদ্ধশীল ঐতিহ্য সম্পর্কে ধারণা করতে পারে, কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে ঐতিহ্যের প্রতি তাদের অবহেলাও কম নয়। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাংলা সন বা তারিখ বাঙালির জাতীয় জীবনে তেমন একটা ব্যবহার করা হয় না। বিশ্বনাগরিক এবং বিশ্বঐতিহ্যের অংশ হিশেবে বাঙালি তার নিজস্ব সমৃদ্ধশীল ঐতিহ্যকে অবহেলা করা অনুচিত, বরং যা বাঙালি ঐতিহ্যের মানসিকতাকে সমর্থন করে না তা বর্জন করাই একান্ত প্রয়োজন, কারণ 'বিশ্ব মানব হবি যদি, কায়মনে বাঙালি হ।' বাঙালির তাই তো জানা প্রয়োজন বাংলার লোকজীবনের অনুষঙ্গগুলি– চৈত্রে রবিশস্য ও চালিতা পিঠা, বৈশাখে নলিতা ও বোরো ধান, জ্যৈষ্ঠে কাঁঠল ও পাকা-ফল, আষাঢ়ে খই ও দই, শ্রাবণে মিঠাই, ভাদ্রে তালের পিঠা, আশ্বিনে শসা, কার্তিকে খইলসার ঝোল, অগ্রহায়ণে ভোলাপোড়া[১] ও

[১] ভোলা ছাড়, ভুলি ছাড়।/ বারমাইয়া পিছাইয়া ছাড়।/ মশা মাছি দূর কর।/ ধানে চালে ঘর ভর।/ ভাত খাইয়া লড়বড়।/ জল খাইয়া পেট ভর।

পিঠা, পৌষে রস ও পুলি, শীতে গুড় ও ভাপাপিঠা, মাঘে তেল, ফাল্গুনে বেল। এরসঙ্গে জড়িয়ে আছে মাসভিত্তিক বাঙালি লোকজীবনের এক বিশেষ অঙ্গ ব্রতগুলি– (১) বৈশাখে– বনবিবি, পুণ্যিপুকুর, অক্ষয়ফল, অশ্বত্থপাতা, ফলগছানো, নিৎসিঁদুর, রূপহলুদ, আদাহলুদ, কলাছড়া, বেলভাত, বৈশাখী-পূর্ণিমা, সুবচনী, বসুধারা ইত্যাদি; (২) জ্যৈষ্ঠে– জয়মঙ্গলবার, অরণ্যষষ্ঠী, জামাইষষ্ঠী, চাঁপাচন্দন, জ্যেষ্ঠচম্পক ইত্যাদি; (৩) আষাঢ়ে– কুলো-নামানো, বিপত্তারিণী, অম্বুবাচী, মেঘরাণী ইত্যাদি; (৪) শ্রাবণে– মনসা, লোটন, নাগপঞ্চমী ইত্যাদি; (৫) ভাদ্রে– কানুপীর, ভাদুলি, ভাঁজো, অরন্ধন, মন্থন, পেঁচাপেঁচী, ভাদ্রচণ্ডী ইত্যাদি; (৬) আশ্বিনে– গাড়শী, সৌভাগ্য-চতুর্থী ইত্যাদি; (৭) কার্তিকে– ভোলাপোড়া, যমপুকুর, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, বকপঞ্চক, আকাশপ্রদীপ, কুলকুলতি, ভাইফোঁটা ইত্যাদি; (৮) অগ্রহায়ণে– নবান্ন-পার্বণ, নাটাইচণ্ডী, মঙ্গলচণ্ডী, সেঁজুতি, ক্ষেত্র ইত্যাদি; (৯) পৌষে– তুষ-তুষসি, তারা, পৌষপার্বণ, সুয়ো-দুয়ো ইত্যাদি; (১০) মাঘে– বাঘাই, মাঘমণ্ডল, শীতলাষষ্ঠী, মাঘসপ্তমী ইত্যাদি; (১১) ফাল্গুনে– দোলা, গোষষ্ঠী, ফাল্গুনকুণা, গাছগুঁড়ি ইত্যাদি; (১২) চৈত্রে– নীলষষ্ঠী, নখছুট, ফলদান, বারোমেসে সুবচনী, ঘেঁটু ইত্যাদি। এসব লোকানুষ্ঠানের মধ্যে লুকিয়ে আছে বাঙালির হাজার বছরের সংগ্রামী জীবনের রূঢ় বাস্তবতা, অভাব-অনটন-দারিদ্রতাসহ লোকসমাজজীবনের ছবি, পারিবারিক-সামাজিক আশা-আকাঙ্ক্ষার চিত্রগুলি। স্বামী-পুত্র-ধন-ঐশ্বর্য-সাংসারিক মঙ্গলকামনাই বেশীর ভাগ ব্রতপালনের উদ্দেশ্য, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম পালনের অংশ অবশ্যি নয়।

পয়লা বৈশাখের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রশ্নটিও। বাঙালি বুলি আওড়াতে গিয়ে বলে, 'বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে হলুদ রুইবে, অন্য কাজ ফেলিয়া থুইবে, আষাঢ়-শ্রাবণে নিড়াইয়া মাটি ভাদ্রে করবে খাঁটি, ফাল্গুনে না রুইলে ওল হয় শেষে গণ্ডগোল।'[২] তাই পয়লা বৈশাখের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে একটি সর্বজনীন আচরণীয় অনুষ্ঠান, বাঙালির চিরন্তন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রধান অঙ্গ ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়– 'শুভ হালখাতা'। প্রযুক্তির দাপটেও ব্যবসায়ীদের আনুষ্ঠানিক উদ্যোগে সাড়ম্বরে নতুন হিশেব-নিকাশের 'শুভ হালখাতা' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বাঙালি জীবনের জীর্ণ খাতাকে বদলে একটি নূতন খাতা খোলাই হচ্ছে এর আদর্শিক লক্ষ্য ও শর্তাবলি। 'শুভ হালখাতা' অনুষ্ঠানে ব্যবসায়ীদের কাজ-কারবারের লেনদেন, বাকি-বকেয়া, উসুল-আদায় সবকিছুর হিশেবনিকাশ লিখে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। ব্যবসায়ীরা নতুন বছরের শুরুতে বাঙালি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিশেবে মিষ্টান্ন আপ্যায়নে ব্যবসার শুভ সূচনা করেন। মানুষে মানুষে হৃদ্যতা ও সম্প্রীতির বন্ধনে মধুর মতো স্বাদযুক্ত মিষ্টির ভূমিকা অবিসংবাদী, প্রীতিপদ ও প্রীতিদায়ক। 'শুভ হালখাতা' অনুষ্ঠানে রকমারি মিষ্টি না-হলে চলে না বাঙালির। পাত্রপাত্রী, শত্রুমিত্র নির্বিশেষে মিষ্টিমুখ করানো একটি আকর্ষণীয় বিষয়। গ্রামবাংলায় চলে লোকজমিষ্টি বিতরণ– মুড়ি, মুড়কি, কদমা, বাতাসা, তিলা, মুরলি, গাট্টা, খাজা, গুড়ের জিলাপি, গজা ইত্যাদি। আর শহরে-বন্দরে চলে মৌ-মৌ মিষ্টিমধুর সুগন্ধ– রসগোলা, লালমোহন, ক্ষীরমোহন, চমচম, সন্দেশ, কাঁচাগোলা, অমৃতভোগ, কাঁচাসন্দেশ, কাটারিভোগ, আনন্দভোগ, ক্ষিরপেয়ারা, মাওয়া, লাড্ডু, দধিহালুয়া, ছানার আমির্তি, পেস্তা-বাদাম-আখরোট-কিশমিশ সুশোভিত শুকনো মিষ্টি, রসমালাই ইত্যাদি।

জীবন ও প্রকৃতিতে পয়লা বৈশাখ নিয়ে আসে নবজীবনের উদ্দীপনা, আনন্দ ও প্রেরণার বার্তা। গাছে গাছে সবুজাভ পাতায় স্বর্ণলতা রোদ্রের মাঝে ঢেউ খেলে; বাতাসের দোলায় নদীর তীর ধরে বয়ে চলে কুলকুল ধ্বনি; ঝাউবনে, বটের জটায় চিরচঞ্চল দুপুর নৃত্য করে বেড়ায়; গাছের তলায়, বাগবাগিচায় প্রাকৃতিক একরকম পরিবর্তন দেখা দেয়– এসব উপেক্ষা করা বাঙালির পক্ষে অসম্ভব, কেন না এরসঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে বাঙালির জীবনসূত্র, অর্থনীতি। কাজেই বাংলাঞ্চলে পয়লা বৈশাখ আসে জনমানুষের অন্তর জুড়ে, অকৃত্রিম আনন্দ ও আবেগ নিয়ে।

[২] আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য, ৪র্থ খণ্ড, ১৯৬৬।